গবেষণা সারসংক্ষেপ

উপকূলীয় জেলেদের আইনগত অধিকার ও জীবনমান উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা প্রতিবেদন

জাতীয় পর্যায়ে জেলেদের অবদানের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি চাই

ভূমিকা :

মৎস্য খাত প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মৎস্যখাত থেকে দেশের মোট রপ্তানি আয়ের প্রায় ৩%, জিডিপির ৪.৩৭% এবং মোট কৃষি খাতের ২৩.৭% ভাগ অর্জিত হয়। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে মোট বার্ষিক মৎস্য উৎপাদন ছিল ৩৪,১০,২৫৪ মেট্রিক টন এবং ইলিশের উৎপাদন ছিল ৩.৫১ লক্ষ মেট্রিক টন, যা দেশে মাছের মোট উৎপাদনের ১১% এবং জিডিপির ১% (Sharker et all, Fish Aqua J 2016 7.2). মাছ বাংলাদেশের মানুষের দৈনন্দিন খাবারের অন্যতম একটি উপাদান যা প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০% সরবরাহ করে।

প্রচুর পরিমাণে স্বাদু পানির মাছ উৎপাদনের পরেও দেশ জেলেদের ধৃত মাছের উপরে বহুলাংশে নির্ভরশীল। দেশজ মাছের উৎপাদন ১০-১২ টি উপকূলীয় জেলাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। প্রতি বছর ভোলা জেলা সারা দেশের মধ্যে একক ভাবে সর্বোচ্চ মাছ এবং একই সাথে ইলিশ মাছ আহরণ করে থাকে। এর ফলে ভোলা জেলা এবং এর সকল উপজেলাসমূহ ক্ষুদ্র জেলেদের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছে। আর এই কারণে সমগ্র উপকূলীয় এলাকা এবং এখানের জেলে সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে ভোলা জেলাকে এই জরিপের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই এখানকার জেলেদেরও পরিবারের ভরণপোষণ করার জন্য মাছ ধরা ছাড়া অন্য কোন বিকল্প উপায় নেই। মূল ভূখণ্ড হতে বিচ্ছিন্ন হবার কারণে জেলেরা অধিকাংশ সময়েই জীবিকার নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয় এবং প্রায়শই ন্যায় বিচার এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনি কর্মকাণ্ডের সুবিধা ভোগ করতে পারে না।

সুবিধাবঞ্চিত অসহায় দরিদ্রগোষ্ঠীর ন্যায় বিচারের জন্য সহযোগিতা করার লক্ষ্যে কোস্ট ট্রাস্ট যুক্তরাজ্য সরকারের অর্থায়নে "কমিউনিটি লিগ্যাল সার্ভিস" এর সহায়তায় "নিরাপত্তার জন্য ন্যায়বিচার: কমিউনিটির জন্য আইনী সেবা প্রদানের একটি উদ্যোগ" সংক্রান্ত প্রকল্পটি ভোলা জেলার ২৫ টি ইউনিয়নে বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটির পক্ষ থেকে উপকূলীয় জেলেদের নিরাপত্তা ও আইনগত অধিকার রক্ষা বিষয়ে এই গবেষণা কার্যটি পরিচালিত হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনে উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদান, ভোলা জেলার জেলেদের আর্থ-সামাজিক জীবিকা, জেলে সমাজের সার্বিক সমস্যাসমূহ, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি , ইলিশ সংরক্ষণ এবং আর্থিক অনুদান, টিকে থাকার জন্য জীবিকার কৌশল, করণীয় সমূহ, নীতিমালা বাস্তবায়নসহ সুনির্দিষ্ট কতিপয় সুপারিশমালা তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণার উদ্দেশ্য:

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হল ভোলা জেলার উপকূলীয় এলাকায় ক্ষুদ্র মৎস্যজীবীদের জীবিকার বর্তমান পরিস্থিতি এবং তাদের ঝুঁকি এবং দুর্দশার পেছনে কারণসমূহ অনুসন্ধান করা। বিশেষত, জরিপের মূল লক্ষ্য ছিলঃ

- শিক্ষা, আয়, স্বাস্থ্য ইত্যাদির বিচারে মৎস্যজীবিদের বর্তমান ভৌগলিক এবং আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট অনুসন্ধান করা।
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবিরা তাদের অধিকার, ন্যায় বিচার এবং টেকসই জীবিকার ক্ষেত্রে যেসব সমস্যা, ঝুঁকি এবং দুর্যোগের সম্মুখীন হয় সেগুলো অনুসন্ধান করা।
- মৎস্যজীবি সমাজের কল্যাণের জন্য নীতিমালা পূনর্গঠনের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকদের অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম সম্পর্কিত সমস্যাগুলো শনাক্ত করা।
- ক্ষুদ্র মৎস্যজীবিদের সমস্যা মোকাবেলায় নীতিমালা প্রণয়নের সুপারিশ প্রদান।

পদ্ধতিঃ

এই গবেষণার তথ্য প্রাথমিক এবং সেকেন্ডারি উভয় উৎস থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। সেকেন্ডারি ডাটা মূলত ক্ষুদ্র মৎস্যজীবিদের কার্যক্রম সম্পর্কিত বিভিন্ন দলিল যেমন,

নথিপত্র, বই, সাময়িকী, এবং ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সেকেন্ডারি ডাটা ছাড়াও ভোলা জেলার মৎস্য কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সরকারী এবং বেসরকারী অংশীদারদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রাইমারি ডাটা চরফ্যাশন উপজেলার একদল জেলেদের সাথে তিনটি ফোকাস গ্রুফ ডিস্কাশনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছে। সর্বশেষে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গের সাথে একটি সভার মাধ্যমে গবেষণা প্রাপ্ত ফলাফল যাচাই করে চুড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে।

ভোলা জেলায় উপকূলীয় মৎস্য সম্পদ এবং জাতীয় অর্থনীতিতে এর অবদানঃ

কৌশলগত দিক থেকে সুবিধাজনক অবস্থানের কারণে ভোলা জেলায় প্রতি বছর সর্বোচ্চ পরিমাণে উৎকৃষ্ট মানের ইলিশ আহরিত হয়। ভোলা জেলাকে পরিবেষ্টিত করে রাখা নদীসমূহ বিশেষত, তেতুলিয়া এবং এর শাখাসমূহ ইলিশের প্রজনন এবং বেড়ে ওঠার উত্তম স্থান। প্রজনন মৌসুমে ইলিশের স্থান পরিবর্তনের মূল নদীগুলোও ভোলা জেলার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত। যার ফলে, সারা বছর এই জেলার নদীতে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ পাওয়া যায় এবং জেলেরা প্রতি বছর প্রায় ১১৪,৬৪৬ মেট্রিক টন ইলিশ সহ মোট ১৬০,৮০৮ মেট্রিক টন মাছ আহরণ করে (বাংলাদেশ মৎস্য হ্যান্ডবুক-২০১৩-১৪)। উল্লেখ্য যে, উপকূলীয় এলাকার জেলেরা ইলিশের প্রাচুর্য এবং উচ্চ মূল্যের কারণে এই মাছ শিকারের উপরে ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল।

ঝুঁকি এবং দুর্যোগ পরিস্থিতি/উপলব্ধিঃ

অন্যান্য জীবিকার মতই জেলেদের জীবিকার নানাবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হয় যা নিম্নে বর্ণিত হলঃ

॥ পরিবেশের সমন্বিত বিপর্যয়, জলবায়ু পরিবর্তন এবং মাছের ভ্রমণস্থল, জৈবাবস্থা এবং প্রজনন স্থানের পরিবর্তনের কারণে প্রতিনিয়তই মাছের উৎপাদন কমছে।

॥ তারা নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড়, বন্যা এবং জোয়ারের ঢেউ ইত্যাদির কাছে অসহায়। ঝড় এবং বন্যার পাশাপাশি প্রায় প্রতিবছর ভয়াবহ সাইক্লোন (উঁচু পানির ঢেউসহ) আঘাত হানে এবং জেলেদের জীবন এবং জীবিকার মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

॥ বস্তুগত সম্পদের পাশাপাশি উপকূলীয় অঞ্চলের জেলেরা যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন ঝড় কিংবা সাইক্লোনের সময়ে সবচেয়ে বেশি প্রাণ ভয়ে থাকে।

॥ কক্সবাজার থেকে পটুয়াখালী পর্যন্ত সমগ্র উপকূলজুড়ে জলদস্যুদের প্রভাব খুব বেশি, এবং প্রায় প্রতিদিনই এই সমগ্র উপকূলজুড়ে জেলেরা ডাকাতদের হাতে তাদের মাছ ধরার সরঞ্জাম এবং ধৃত মাছ হারাচ্ছে।

দুরবস্থা পরিস্থিতি/উপলব্ধি

ভোলা এবং চরফ্যাশন উপজেলা হতে প্রাপ্য সেকেন্ডারি তথ্য বিশ্লেষণ এবং এফজিডি এবং কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউর মাধ্যমে সেগুলোর সত্যতা যাচাইয়ের মাধ্যমে নিম্নের দুরবস্থাসমূহ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া গেছেঃ খাদ্য অনিরাপত্তা, আয়ের অনিশ্চয়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অধিকার এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে সীমাবদ্ধতা।

নানাবিধ দুরবস্থা এবং সামাজিক দুরত্বের কারণে সকল জেলে পাড়াগুলো উন্নত জীবিকা নিশ্চিত এবং ন্যায় বিচার প্রাপ্তিতে নিজেদের অধিকার আদায়ের দাবি উত্থাপন এবং তা রক্ষা করার জন্য যথাযথ অনুপ্রেরণা পায় না। এমনকি যখন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তখনও অন্যান্য শক্তিশালী স্বার্থের কারণে সেগুলো রক্ষা করতে পারে না।

জেলে সমাজের সমন্বিত মূল সমস্যা সমূহঃ

বিভিন্ন জরিপে প্রাপ্ত তথ্য এবং বর্তমান পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ শেষে নিচের সমস্যাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়ঃ মাছের উৎপাদন/ আহরণ হ্রাস, অসন্তোষজনক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, ঋণ প্রাপ্তির সুযোগের অভাব, সুশাসন সংশ্লিষ্ট সমস্যা সমূহ, উলকূলীয় এলাকায় ঘন ঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগের আঘাত, বিকল্প আয় বর্ধক কাজের অভাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অভাব, অবকাঠামোর অভাব, জেলে সম্প্রদায়ের অধিকার সমূহ, উপকূলীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক এবং নীতিগত কাঠামোর অভাব রয়েছে।

জেলেদের বর্ণিত জীবিকার সীমাবদ্ধতা সমূহঃ

জেলেদের স্বস্ফুর্তভাবে উত্থাপিত সীমাবদ্ধতা সমূহ নিম্নে বর্ণিত হলঃ

॥ সকল অভয়ারণ্যগুলোর সীমানা যথাযথভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। এর ফলে কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থানীয় জেলেরা মাছ ধরা থেকে বঞ্চিত হয়, যা তাদের জীবিকার ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

॥ অনুদান প্রদানের জন্য মৎস্য বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত জেলেদের তালিকায় অনেক জেলেরই নাম নেই।

॥ জেলেদের তালিকায় শুধু তাদেরই নাম অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে যাদের জাতীয় পরিচয়পত্র আছে এবং যাদের বয়স ১৮ বছরের বেশি, এর ফলে প্রায় ৫০% জেলে অনিবন্ধিত রয়ে গেছে। যার অর্থ তারা সরকারের কাছ থেকে কোন সহায়তা পাবে না। উপরন্তু, অনেক জেলেই অন্যান্য কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নিবন্ধনকালীন সময়ে উপস্থিত থাকতে পারেনি।

॥ খাদ্য এবং নগদ অর্থ এই উভয় ধরণের অনুদানই নিষেধাজ্ঞা পরবর্তী সময়ে প্রদান করা হয় এর ফলে এই সাহায্য জেলেদের

কঠিন সময়ে তেমন কোন সহায়তা করতে পারে না।

॥ খাবার এবং আয় বর্ধক কাজের সুবিধার পরিমাণ খুবই কম। ৩-৪ মাস সময়ের জন্য পরিবারের সদস্য নির্বিশেষে প্রতি পরিবারকে মাসিক ৩০ কেজি চাল প্রদান করা হয়। উপরন্তু, জেলেদের সংখ্যার বিচারে খুব কম সংখ্যক জেলেই আয় বর্ধক কাজের সুযোগ পায়।

ইলিশ সংরক্ষণ এবং আর্থিক অনুদান/প্রণোদনাঃ

এক পরিসংখ্যানে দেখা গেছে যে, দেশের মূল উপকূলীয় এলাকার প্রায় ৫ লাখ প্রান্তিক জেলে বিদ্যমান নীতিমালার দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে তাদের অধিকার এবং ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারছে কিনা। যদিও সব এলাকায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ এমন এলাকার ব্যাপ্তি সমান না, কিন্তু ভোলা জেলার জেলেদের জন্য এমন এলাকা অনেক বিস্তৃত। সরকার ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছে। সরকার মনে করছে ইলিশের এই উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে ইলিশ সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ কর্মসূচির অবদান আছে। এর কারণেই ২০১৩-১৪ মৌসুমে ৩৫৮,০০০ মেট্রিক টন ইলিশের উৎপাদন হয়েছে যা ২০১২-১৩ মৌসুমের (৩৫১,০০০, প্রতি কেজি ৪০০ টাকা দরে) তুলনায় ৩৪,০০০ মেট্রিক টন বেশি। যদি এই সংখ্যাটা সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের পূর্বের সময় অর্থাৎ ২০০২-০৩ (১৯৯.০৩ মেট্রিক টন) মৌসুমের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে এর পরিমাণ দাঁড়াবে ১৮৬,০০০ মেট্রিক টন যার আনুমানিক মূল্য প্রায় ৭,৪৪০ কোটি টাকা।

তথাপি, এই সংরক্ষণ নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য সরকার ভুক্তভোগী জেলে পরিবারগুলোকে খাদ্য সহায়তা এবং বিকল্প আয় বর্ধক কাজের সুযোগের মাধ্যমে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করেছে যাতে তারা সাময়িক নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ে নিজেদের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে এবং এই নীতিমালা বাস্তবায়নে তাদেরকে উৎসাহিত হয়।

২০১৩-১৪ মৌসুমে খাদ্য শস্য হিসেবে ১২৪.৫ কোটি টাকা (প্রতি কেজি চাল ৩৫ টাকা দরে) এবং বিকল্প আয় বর্ধক কর্মসূচিতে ১৩৮,০৯৩ টাকা, সর্বমোট ২২৪,১০২ টি পরিবারকে ১২৫.৫৩ কোটি টাকার সমপরিমাণ সহায়তা দেয়া হয়েছে। ইলিশের আবাসস্থল সংরক্ষণে ব্যাপক অবদান রাখার পরেও এসব দরিদ্র জেলেরা নিঃসন্দেহে ন্যায়বিচার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অতএব, জেলেদের নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ন্যায় বিচার নিশ্চিতে সোচ্চার হতে হবে এবং প্রয়োজনে সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত যেতে হবে।

টিকে থাকার জন্য জীবিকার কৌশলঃ

ডি এফ আই ডি পরিচালিত বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছের বাজার ব্যবস্থাপনা এবং উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা শিরোনামে পরিচালিত এক সমন্বিত জরিপে দেখা গেছে, চরম দরিদ্রতায় টিকে থাকার কৌশল হিসেবে উপকূলীয় জেলেরা কারেন্ট জাল দিয়ে জাটকা মাছ (অপ্রাপ্ত বয়স্ক) ধরতে বাধ্য হয়, যদিও জাটকা মাছ ধরা এবং কারেন্ট জাল ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। যেহেতু তাদের অন্য কোন বিকল্প পথ নেই, তাদের ভবিষ্যত জীবিকায় ব্যাপক প্রভাবের আশংকা থাকা সত্ত্বেও তারা টিকে থাকার প্রাথমিক অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে এধরণের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত হয়। অবৈধ এই কাজ করার সময় কখনো কখনো তারা তাদের ধৃত মাছ এবং মাছ ধরার সরঞ্জামাদি হারায়, বিশেষত পুলিশ যখন এসব অবৈধ কার্যক্রম বন্ধে অভিযান পরিচালনা করে। মাঝে মধ্যে পুলিশকে ঘুষ প্রদানের মাধ্যমে তারা তাদের মাছ এবং জাল রক্ষা করতে পারে। এমনকি মাছের ব্যবসায়ী এবং জাল বিক্রেতাদেরও জাটকা মাছ এবং কারেন্ট জাল বিক্রির অনুমতি পেতে পুলিশকে ঘুষ দিতে হয়। এর ফলে অপর্যাপ্ত নীতিমালার কারণে জেলেরা শুধুমাত্র অপরাধের সাথেই শুধু জড়িয়ে পড়ছে না তাদেরকে দ্রুত সময়ের মধ্যে নিঃস্ব করে দিচ্ছে।

নীতিমালা বাস্তবায়নে সুপারিশমালাঃ

॥ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে জেলেদের বাড়ির ভৌগলিক অবস্থা নির্ধারণ সহ জেলে পরিবারগুলোর একটি তালিকা/ডাটাবেইস তৈরি করতে হবে। এই প্রক্রিয়া কর্তৃপক্ষকে জেলেদের নিবন্ধন এবং পরিচয় নিশ্চিত সংক্রান্ত অনের সমস্যার হাত থেকে রক্ষা করবে। একই সাথে প্রযুক্তির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর কম খরচে জেলেদের তথ্য হালনাগাদ করা যাবে। জেলেদের এমন ডাটাবেইস হবে সব ধরণের লেন-দেনের মূল ভিত্তি যা সত্যিকার অর্থেই নিয়মিত ভাবে দেখাশোনা করা যাবে। পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে একই প্রক্রিয়ায় জেলেদের নৌকার অবস্থান জানা যাবে, বিশেষ করে ঝুকিঁপূর্ণ আবহাওয়ার সময়ে।

॥ উপকূলীয় এলাকার মানুষের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিতে পারে এমন একটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায়ের জন্য চলমান ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা পর্যালোচনা এবং পুনঃনকশা করা প্রয়োজন যেখানে সঞ্চয়ের উপরে বেশি গুরুত্ব থাকবে। এনজিওগুলোকে স্থানীয়

অবস্থা (যেমন–ঝুকিঁ, মৌসুম, প্রয়োজনীয় লোনের পরিমাণ, আয়ের প্রবাহ ইত্যাদি) বিবেচনা করে উৎপাদনশীল খাতে সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে নিষেধাজ্ঞা চলাকালীন সময়ে উপকূলীয় এলাকায় চলমান ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সকল ধরণের কিস্তি আদায় বন্ধে নীতিমালা প্রনয়ন করতে হবে।

॥ মাছ ধরার চাপ কমানোর জন্য এই ক্ষেত্রে অনেক বেশি জেলের আগমণ প্রতিরোধ করতে হবে। দীর্ঘ সময়ের জন্য বিশেষ পরিকল্পনার মাধ্যমে জেলেদের জন্য কার্যকর বিকল্প জীবিকার ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে যুবক শ্রেণিকে আয় বর্ধক পেশায় সম্পৃক্ত করতে হবে। তরুণ জেলেদের জন্য আয়বর্ধক কাজের ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা, অনুপ্রেরণা, এবং সহায়তা দিতে হবে এবং সরকারী এবং বেসরকারীভাবে জেলে সম্প্রদায়ের উপরে বিশদ গবেষণা পরিচালনা করতে হবে।

॥ উপকূলীয় এলাকার জন্য বিশদভাবে সরকার কিংবা দাতা সংস্থার অর্থায়নে সামাজিক উন্নয়ন/ক্ষমতায়ন এবং নেতৃত্ব বিকাশে প্রকল্প শক্তিশালী করতে হবে। সামাজিক সংগঠনগুলোকে শক্তিশালীকরণ এবং দরিদ্রদের অধিক অন্তর্ভুক্তির জন্য চেষ্টা চালাতে হবে।

॥ প্রতিক্রিয়াশীল একটি কৃষি সম্প্রসারণ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। উদাহরণ স্বরূপ, সমাজে প্রয়োজন অনুসারে সেবার জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা দরকার এবং সংহত এবং সমন্বিত সম্প্রসারণ সেবা নিশ্চিতে সমাজ ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) স্থাপন এবং এর ক্ষমতায়ন প্রয়োজন। প্রতিটি জেলে সম্প্রদায়ে অভিজ্ঞ একটি এনজিওকে সিবিওগুলোকে সংগঠিত এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে।

উপকূলীয় এফ এম রেডিও ষ্টেশন কাম তথ্য কেন্দ্র এবং অন্যান্য মিডিয়ার মাধ্যমে প্রতিদিনের আবহাওয়া, বাজার ব্যবস্থা এবং জেলে সম্প্রদায়ের দৈনন্দিন জীবনে প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত তথ্যাবলী প্রচার করতে হবে। তথ্য প্রচার এবং এতে সবার প্রবেশে সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

॥ দরিদ্রদের মাঝে ন্যায্য উপায়ে চরের/খাস জমি বিতরণের ব্যবস্থা করতে হবে; যাদের জমি এবং বসত–ভিটা নদী ভাঙনের স্বীকার হয়েছে তাদেরকে অগ্রাধিকার দিতে হবে (যেমন চর উন্নয়ন এবং জরিপ প্রকল্প–সিএসডিপি); জেলেদের বেস্টনকারী রাস্তা, সাইক্লোন সেল্টার, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, এবং বিদ্যুৎ সরবরাহের মতো অবকাঠামোগুলো সরকারের অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকা উচিৎ।

॥ সংবাদ সংস্থা, এনজিও, এবং স্থানীয় সম্প্রদায়কে সিবিও ভিত্তিক অ্যাডভোকেসি কার্যক্রমে অনুপ্রাণিত করা এবং সংক্রান্ত প্রকল্প চালু করা উচিৎ ।

উপসংহারঃ

উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের প্রাচুর্য শুধু তখনই জেলে সম্প্রদায়ের উপকারে আসবে যখন তাদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত হবে, একটা সম্মানজনক জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। যেসব অধিকার জেলেরা নিজেদের বলে দাবি এবং সংরক্ষণ করতে পারবে না সেসব দ্বারা তাদের দরিদ্র্য নিরসন করা যাবে না। টেকসই জীবিকা এবং সম্পদ সৃষ্টিতে সফল হবার লক্ষ্যে জেলে সম্প্রদায়ের জন্য যে কোন উদ্যোগ গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই জেলে সম্প্রদায়ের সামাজিক অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত বিষয়সমূহ নজরে আনতে হবে, যাতে করে জেলে সম্প্রদায়ের দরিদ্রতার বিষয়টি নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে প্রকাশিত এবং জ্ঞাত হয়। কারণ, প্রান্তিক জেলেদের বর্তমান দুরবস্থা এবং দরিদ্রতার পেছনে একটি মাত্র কারণ রয়েছে, যথা– জাতীয় অর্থনীতিতে তাদের অবদান নীতিনির্ধারকদের দ্বারা মূল্যায়িত কিংবা স্বীকৃত হয় না কিংবা এর গুরুত্ব তাদের কাছে অজানা। আলোচিত বিষয়গুলো প্রতিটি জেলে সম্প্রদায়ের অসংগঠিত অবস্থা এবং যথাযথ নেতৃত্বের অভাবেই ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। সিবিও এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে পেশাদার দিক নির্দেশনা প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রান্তিক জেলে পরিবার থেকে উঠে আসা নেতৃত্বের উত্থান এবং বিকাশ ঘটতে পারে। কোস্ট ট্রাস্ট এক্ষেত্রে কোন দাতা গোষ্ঠীর সহায়তায় সিবিও প্রতিষ্ঠা এবং প্রান্তিক জেলে পরিবারের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি প্রকল্প চালু করতে পারে, যেটি তাদের অধিকারের পক্ষে আওয়াজ তুলবে এবং একটি টেকসই জীবিকা নিশ্চিত করতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ:

শওকত আলী টুটুল ০১৭১৩ ১৪৪১৭৭

মোঃ জহিরুল ইসলাম ০১৭১৩৩২৮৪৩১

participates in survival strategies of coastal poor

COAST The Coastal Association for Social Transformation Trust

কোস্ট ট্রাস্ট

বাড়ি ১৩, রোড ২, শ্যামলী, ঢাকা–১২০৭

ফোন: ৯১২০৩৫৮, ৯১১৮৪৩৫

ওয়েবসাইট:**www.coastbd.net**